Living the Lotus

Buddhism in Everyday Life

8
2026
VOL. 251

Dharma Centers Across India Observe Ancestor Veneration Weeks, July 1–15: Members Perform the Ullambana Ceremony on July 15 with Hearts Full of Gratitude

Living the Lotus
Vol. 251 (August 2026)

Senior Editor: Rev. Takashi Maeda
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই। বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা～দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

অন্যের কল্যাণে প্রদীপ জ্বালালে

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই

ওমে ট্রেনিং সেন্টারে গাকুরিন ছাত্রছাত্রীদের চাষাবাদ ‘ধানবোনা উৎসব’ এ অংশগ্রহণ (জুন মাস)।

“অন্যের জন্য”–আসলে কার জন্য?

আমরা প্রায়ই বলি, মানুষ একা বাঁচতে পারে না; একে অপরের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়েই আমাদের জীবন বিকশিত হয়। পারস্পরিক নির্ভরতার এই অমূল্য সম্পর্কের প্রতি কৃতজ্ঞতাও আমরা স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ করি। তাই বিপদের সময় আমরা বলি, “বিপদে-আপদে আমরা একে অপরের আপন।” আবার বলা হয়, “পথচলায় সঙ্গী যেমন প্রয়োজন, তেমনি সমাজে মানুষের প্রতি মমতাই জীবনের প্রকৃত আশ্রয়।” জাপানে এ ধরনের প্রবাদ-প্রবচন বহু প্রজন্ম ধরে মানুষের জীবনবোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে।

তবে এই মূল্যবোধ কেবল জাপানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকার ঘানা প্রজাতন্ত্রে মানুষের হৃদয়ে একটি গভীর বিশ্বাস প্রোথিত রয়েছে—”আমি যতই দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ি না কেন, কখনো অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব না।‘ কারণ, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে বিপদের সময় কেউ না কেউ অবশ্যই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, পাশে এসে দাঁড়াবে। একে অপরের প্রতি এই অটুট আস্থাই তাদের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও প্রফুল্ল, আশাবাদী ও ইতিবাচক মন নিয়ে জীবনযাপন করার শক্তি জোগায়। এই মানসিকতাকেই বলা হয় “ঘানা ম্যাজিক‘। নিশ্চয়ই, শুধু ঘানাতেই নয়, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ ও সমাজেই পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর এই চেতনাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে নিজস্ব সংস্কৃতি, জীবনদর্শন, রীতি-নীতি ও প্রবাদ-প্রবচন।

এই একই ভাবধারা প্রকাশ করে জাপানের একটি বহুল পরিচিত প্রবাদ—”দয়া কেবল অন্যের জন্য নয়।‘ এর প্রকৃত অর্থ হলো, অন্যের প্রতি যে সহানুভূতি, দয়া ও মমতা আমরা প্রদর্শন করি, তা একদিন কোনো না কোনোভাবে আমাদের কাছেই ফিরে আসে এবং আমাদের জীবনকেও কল্যাণময় করে তোলে। এই প্রবাদটি আমাদের শেখায়, পৃথিবী মূলত পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

তাছাড়া, দান পারমিতার তাৎপর্য ও তার পুণ্যফল সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধর্মগুরু নিচিরেন বলেছেন—”অন্যকে দান করলে, শেষ পর্যন্ত তা নিজেরই কল্যাণে আসে। যেমন, অন্যের জন্য একটি প্রদীপ জ্বালালে, সেই আলোয় নিজের পথও আলোকিত হয়ে ওঠে।‘ এই বাণীও আমাদের একই সত্য উপলব্ধি করায় যে “দয়া কেবল অন্যের জন্য নয়”। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে, “অন্যের জন্য‘—এই মানসিকতা ও জীবনদৃষ্টির প্রতি অনেকের মনেই প্রশ্ন ও দ্বিধা সৃষ্টি

হয়েছে। অনেকে মনে করেন, অন্যের জন্য কাজ করা মানেই নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া বা আত্মত্যাগ করা। ফলে অন্যের কল্যাণে সময়, শ্রম কিংবা মনোযোগ ব্যয় করাকে তাঁরা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। এমনকি, অন্যের জন্য নিজেকে নিবেদন করাকে পুণ্যের কাজ হিসেবে মূল্যায়ন করতেও অনেকের অনীহা দেখা যায়।

এই আধুনিক সমাজে কীভাবে আমরা এমন একটি মানবিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি, যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা, "আমরা একে অপরের জন্য'—এই চেতনা মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়? কীভাবে এমন একটি সমাজকে ধরে রাখা সম্ভব, যেখানে প্রত্যেকে অপরের প্রতি সদয়, সহমর্মী ও শ্রদ্ধাশীল, এবং সবাই নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারে?

স্বেচ্ছাসেবী বোধিসত্ত্বদের বন্দনা

গ্রীষ্মকালীন ছুটিকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই নিজেদের মূল্যবান সময় অন্যের কল্যাণে উৎসর্গ করে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন।

'স্বেচ্ছাসেবক' বলতে বোঝায়—যিনি সহমর্মিতা ও মানবতার তাগিদে প্রবৃত্তিগতভাবে অসহায় কিংবা বিপদগ্রস্ত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে 'সেবা' শব্দটির মধ্যে জীবের সেবা মানেই বুদ্ধের করুণার বাস্তব প্রকাশ এমন গভীর তাৎপর্য রয়েছে। গত বছর, আওয়াজির বড় ভূমিকম্পের ত্রিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে, পাশাপাশি পূর্ব জাপান ও কুমামোতো ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে যারা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা এমন আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাকর্ম করছেন, যেন তাঁরা স্বয়ং বুদ্ধেরই সেবা করছেন, কিংবা অমূল্য মানবজীবনের সেবায় নিজেদের নিবেদন করেছেন। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকের এমন সেবাকর্ম প্রত্যক্ষ করে, আমি মনে মনে বলেছিলাম "এই মানুষগুলোই তো প্রকৃত বোধিসত্ত্ব।" এমন 'স্বেচ্ছাসেবী বোধিসত্ত্বদের' সংস্পর্শে এলেই আমি নতুন করে উপলব্ধি করি যে, মানুষের হৃদয়ের গভীরে একটি নির্মল আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত হয়ে আছে—"শুধু আমি একা নই; সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সুখী হতে চাই।"

অন্যদিকে, যাঁরা 'অন্যের জন্য কিছু করা'—এই জীবনদৃষ্টিকে সহজে গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁদের যতই বলা হোক, "এই পৃথিবী পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত," তবুও তাতে অনেক সময় উল্টো ফল হতে পারে। কারণ প্রত্যেক মানুষের চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধ ভিন্ন। তাই নিজের মূল্যবোধ অন্যের ওপর চাপিয়ে দিলে, তা তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করার পরিবর্তে বরং আরও দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

তবে বৌদ্ধধর্মে 'দশলোকভূমি'-এর শিক্ষা রয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের হৃদয় সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান। তাই প্রত্যেকের মনেই এই পৃথিবীকে আরও সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলার এক নির্মল আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে। এই সত্যে বিশ্বাস রেখে যদি আমরা নিজের শরীর, মন ও সময় অন্যের কল্যাণে নিবেদন করি, তবে তাঁরাও আমাদের জীবনযাপন ও কর্ম দেখে উপলব্ধি করবেন—অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যে কী গভীর আনন্দ রয়েছে, এবং এটাই সত্য যে, 'এই পৃথিবী পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত।' তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিজের জীবন ও আচরণের মাধ্যমে 'মানুষের প্রতি মমতা ও সহমর্মিতার সংস্কৃতি' পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে, এমনটা বলা কঠিন যে সবাই স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারছে। আমরা কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে ও সম্প্রীতির মধ্যে জীবনযাপন করতে পারি—এবং তার জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী ধরনের বাস্তব অনুশীলন প্রয়োজন—সে বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আরও আলোচনা করার আশা রাখি।

'কোসেই' আগষ্ট ২০২৬ইং।

ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র

ধর্মানুশীলন করুন এখানে, এখনই

即是道場
Sokuze Dojo

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র ও চতুরার্যসত্যের শিক্ষা

ডঃ ডমিনিক স্কারাঞ্জেলো
রিস্‌সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের 'তথাগতের দৈবশক্তি অধ্যায়'-এ উল্লিখিত 'ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র' এমন এক মহৎ শিক্ষা, যা আমাদের নীরবে অনুপ্রাণিত করে যেন আমরা পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয়সহ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্থানকেই সাধনা ও ধর্মচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করি এবং সেখানে বুদ্ধের শিক্ষাকে বাস্তবে অনুশীলন করি।

"দুঃখ সত্য"——ইচ্ছা ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান

এ মাস থেকে বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা 'চতুরার্যসত্য' সম্পর্কে অধ্যয়ন শুরু করব। সাধারণত বৌদ্ধধর্মের আলোচনা চতুরার্যসত্য থেকেই শুরু হয়। তবে আমরা এতদিন এই বিষয়টি আলাদাভাবে আলোচনা করিনি, কারণ আমরা সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিক্ষাকে অনুধাবন করে আসছি।

বুদ্ধত্ব লাভের পর শাক্যমুনিবুদ্ধ যখন প্রথম ধর্মদেশনা প্রদান করেন—যা 'প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে পরিচিত—তখন সর্বপ্রথম তিনি চতুরার্যসত্যের শিক্ষাই উপদেশ দিয়েছিলেন।চতুরার্যসত্যকে প্রায়ই একজন চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন একজন দক্ষ চিকিৎসক প্রথমে রোগ নির্ণয় করেন, তারপর রোগের কারণ খুঁজে বের করেন, রোগমুক্তির সম্ভাবনা জানান এবং শেষে চিকিৎসার পথ নির্দেশ করেন; তেমনি বুদ্ধও মানুষের জীবনের দুঃখ, তার কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি এবং সেই নিবৃত্তির পথ সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। চতুরার্যসত্যের প্রথমটি হলো দুঃখসত্য। এটি মানুষের অন্তরের ব্যাধি। বুদ্ধ বলেছেন, সংসারজীবন নানাবিধ দুঃখে পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই 'দুঃখ' বলতে আসলে কী বোঝানো হয়েছে?

'দুঃখ' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে সাধারণত তীব্র যন্ত্রণা, অসুস্থতা কিংবা শারীরিক ও মানসিক কষ্টের কথা ভেসে ওঠে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেও বহু স্থানে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু—এই চার প্রকার দুঃখের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু যদি দুঃখ বলতে কেবল এই চারটিকেই বোঝানো হতো, তবে অনেকেই হয়তো মনে করতেন, "মানুষের অধিকাংশ দুঃখ তো জীবনের শেষ পর্যায়েই আসে।" তখন বুদ্ধের এই শিক্ষা—"জীবন দুঃখময়"— সহজে গ্রহণ করা কঠিন হতো।

কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের আলোকে বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যায়, 'জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু'-এর আরও গভীর অর্থ রয়েছে। আমরা প্রতিদিন নিজের মানদণ্ডে সবকিছুর বিচার করি—"এটি ভালো", "এটি খারাপ", "এটি কাম্য", "এটি কাম্য নয়"। এই আত্মকেন্দ্রিক ও বিভাজনমূলক মানসিকতার কারণেই আমাদের মনে অসন্তোষ, ক্রোধ, দুঃখ, হতাশা এবং নানাবিধ মানসিক কষ্টের জন্ম হয়। এখানে 'জন্ম' বলতে কেবল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাকে বোঝানো হয়নি; বরং মানুষের মনে একের পর এক দুঃখের উদ্ভব হওয়ার অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে। ('সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের নতুন ব্যাখ্যা', পৃষ্ঠা ১৯৯)।অন্যদিকে 'জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু' বলতে বোঝায় সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা ও উদ্বেগ, যা আমরা অনুভব করি যখন আমাদের প্রিয় মানুষ, কাঙ্ক্ষিত বস্তু কিংবা প্রত্যাশিত পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়, ধীরে ধীরে পুরোনো হয়ে যায়, ভেঙে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যায়। অর্থাৎ, অনিত্যতার বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের আসক্ত মনের যে সংঘর্ষ, সেটিই 'জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু'-এর গভীর তাৎপর্য।এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বুদ্ধের এই শিক্ষা—"জীবন দুঃখময়"—সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কারণ, আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই বারবার 'জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু'-এর এই ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা ঘটে। নতুন আশা ও প্রত্যাশার জন্ম হয়, সেগুলো পরিবর্তিত হয়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং একসময় বিলীন হয়ে যায়। এই চক্রের মধ্য দিয়েই আমরা সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করি। এই অর্থে সত্যিই বলা যায়—মানবজীবন দুঃখে পরিপূর্ণ।

এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে 'দুঃখ' শব্দের প্রকৃত অর্থও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট শিক্ষা দেন, "দুঃখের জন্ম তখনই হয়, যখন বাস্তবতা আমাদের ইচ্ছামতো হয় না।" অর্থাৎ, বুদ্ধ যখন বলেছেন, "জীবন দুঃখময়," তখন তাঁর বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে জীবন কেবল যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ; বরং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে বাস্তবতা প্রায়ই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। আমাদের প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যে

যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, এবং সেই ব্যবধানের ফলে আমাদের অন্তরে যে অস্থিরতা, হতাশা, বেদনা ও মানসিক টানাপোড়েনের জন্ম হয়—সেই অবস্থাকেই বৌদ্ধধর্মে 'দুঃখ' বলা হয়েছে। এই কারণেই বুদ্ধ আরও শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রিয়জনের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, অপছন্দের ব্যক্তি বা পরিস্থিতির সম্মুখিন হওয়া এবং যা কামনা করি তা অর্জন করতে না পারা—এসবই দুঃখের রূপ। এসবই আমাদের নিত্যদিনের জীবনের অত্যন্ত পরিচিত অভিজ্ঞতা।

বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন যে, আরও সুখী, শান্তিময় ও পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে হলে সর্বপ্রথম এই সত্যটি স্বীকার করতে হবে যে, "জীবন দুঃখময়।" আর যখনই দুঃখের উদ্ভব হয়, তখন সেটিকে যথাযথভাবে দুঃখ হিসেবে চিনতে ও উপলব্ধি করতে হবে। বিষয়টি প্রথমে কিছুটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না যে আমরা নিজেরাই দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত আছি। বুদ্ধ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষ প্রায়ই দুঃখের মধ্যেই অবস্থান করেও তাকে সুখ বা ভোগের আনন্দ বলে ভুল করে। দুঃখ ও সুখকে এভাবে গুলিয়ে ফেলার ফলে আমরা এমন চিন্তা ও আচরণের পুনরাবৃত্তি করি, যা শেষ পর্যন্ত আমাদের আরও গভীর দুঃখ, হতাশা ও যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দেয়। অতএব, 'দুঃখসত্য'-এর অনুশীলন বলতে বোঝায়—জীবন যে দুঃখময়, সেই সত্যকে নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসেবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং দৈনন্দিন জীবনে যখনই দুঃখের উদ্ভব হয়, তখন সেটিকে সঠিকভাবে দুঃখ হিসেবে চিনতে শেখা।

তাহলে প্রশ্ন হলো, আমরা কীভাবে নিজের দুঃখকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি? এর একটি উপায় হলো, যখন কোনো কিছু আমাদের ইচ্ছামতো হয় না, তখন নিজের অনুভূতি ও মনের প্রতিক্রিয়ার প্রতি সচেতন হওয়া। এমন পরিস্থিতিতে আমরা হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে তা বুঝতে পারি না, কিন্তু আমাদের অন্তরের গভীরে প্রায়ই উদ্বেগ, বেদনা কিংবা অস্থিরতার জন্ম হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো, যখন আমাদের মনে 'ষড়গতি'-এর বিভিন্ন মানসিক অবস্থা, বিশেষ করে 'চার অপায়' (নরক, প্রেত, তির্যক ও অসুর)-এর মনোভাব প্রকাশ পায়। তখন বুঝতে হবে, দুঃখ ইতিমধ্যেই আমাদের অন্তরে কাজ করছে।

আমাদের অন্তরে ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ঈর্ষার উদ্ভব হয় তখনই, যখন আমরা যে পৃথিবীকে আমাদের ইচ্ছামতো দেখতে চাই, তার সঙ্গে বাস্তবতার ব্যবধান অনুভব করি। সেই ব্যবধান থেকেই আমাদের মনে অসন্তোষ, ক্ষোভ ও অশান্তির জন্ম হয়। যখন কেউ আমাদের কথা শোনে না, কিংবা কোনো কিছু আমাদের ইচ্ছামতো হয় না, তখন আমাদের মনে ক্রোধ জেগে ওঠে। আমরা রাগ করি, বিরক্ত হই, এমনকি অন্যের প্রতি বিদ্বেষও পোষণ করি। যখন আমরা যা কামনা করি তা অর্জন করতে পারি না, তখন আমাদের মনে লোভ প্রকাশ পায়। যখন আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে বিষয়কে উপলব্ধি করার প্রজ্ঞা ও বিচারবোধের অভাব থাকে, তখন আমাদের মন মোহ-এর অবস্থায় থাকে। আর যখন মনে হয়, অন্যরা যেন আমাদের চেয়ে বেশি সাফল্য বা প্রাপ্তি অর্জন করেছে, তখন আমাদের মনে ঈর্ষা জন্ম নেয়। পরিশেষে বলা যায়, যখন আমাদের ইচ্ছামতো হয় না, তখনই মূলত এরূপ বিভিন্ন দুঃখ পাই।

তবে আমরা কি শুরু থেকেই এই মানসিক অবস্থাগুলোকে দুঃখ হিসেবে উপলব্ধি করি? সব সময় তা নয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যখন আমাদের ইচ্ছামতো আচরণ করে না, তখন আমরা তার ওপর ক্রোধ প্রকাশ করলে ক্ষণিকের জন্য এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করতে পারি। এভাবেই, যারা এখনও বোধিলাভ করেনি, তাদের মন অনেক সময় দুঃখকেই সাময়িক সুখ বা আনন্দ বলে ভুল করে।

সুতরাং, যখন এই ধরনের মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়, তখন আমরা তা দুঃখ বলে অনুভব করি বা না-ই করি, অন্তত এই সত্যটি উপলব্ধি করা জরুরি—"এই মুহূর্তে আমি আমার প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যকার ব্যবধান থেকে সৃষ্ট দুঃখের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।"

পরিশেষে, আমাদের শরীরও দুঃখকে চিনতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র প্রদান করে। 'দশস্বরূপতা' নিয়ে অধ্যয়নের সময় আমরা জেনেছি যে, 'স্বতন্ত্র আকৃতি' বলতে আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে বোঝায়—অর্থাৎ মন ও শরীরের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য। তাই অনেক সময় আমরা সচেতনভাবে নিজের দুঃখ উপলব্ধি না করলেও, সেই দুঃখ শরীরের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

সচেতনভাবে মনকে 'এই মুহূর্তে, এখানেই' নিবিষ্ট রাখা—এবং সমগ্র শরীরের প্রতি সজাগ সচেতনতা— এই অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যকার ব্যবধান থেকে সৃষ্ট দুঃখকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি। আর এই সচেতন উপলব্ধির মাধ্যমেই আমরা 'দুঃখসত্য'-এর অনুশীলনকে বাস্তব জীবনে কার্যকর করে তুলতে পারি।

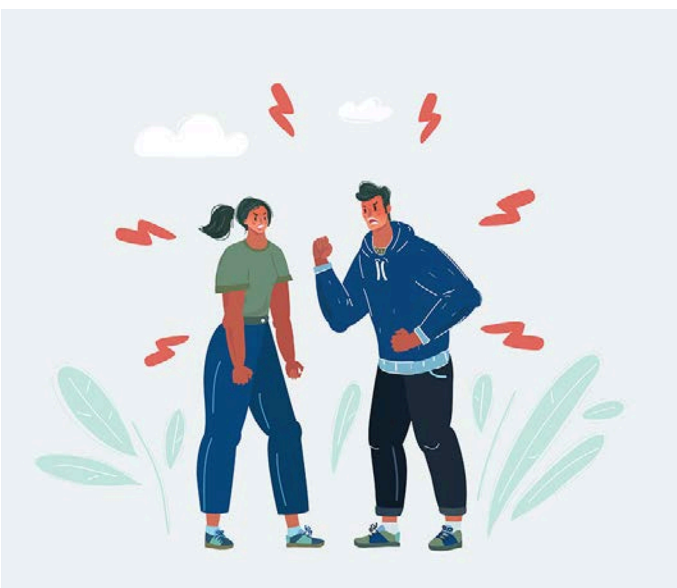

সংঘের কার্যক্রমের প্রতিবেদন

রেভারেন্ড কেইইচি আকাগাওয়া,
মিনিষ্টার, রিস্‌সো কোসই-কাই শ্রীলংকা/বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ।

দুঃখ জয়: পিতা-মাতা ও সন্তানের বন্ধন

এ মাসের 'ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র'-এর আলোচ্য বিষয় হলো চতুরার্যসত্যের প্রথম সত্য—দুঃখসত্য। বুদ্ধের শিক্ষায় বলা হয়েছে, "যখন বাস্তবতা মানুষের প্রত্যাশা বা ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না, তখনই দুঃখের জন্ম হয়।" বাস্তবতা ও আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যখন গভীর ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তখন মানুষের হৃদয় গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি রিস্‌সো কোসেই-কাই বাংলাদেশে আগত এক দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাকে দুঃখসত্যের প্রকৃত অর্থ এবং দুঃখকে অতিক্রম করে মানুষের মহত্ত্ব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দিয়েছে। তাঁদের একমাত্র ছেলে একটি ব্যাংকে কর্মরত। একদিন তাঁরা গভীর উদ্বেগ ও বিষন্নতা নিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, "কিছুদিন ধরে আমাদের ছেলে হঠাৎ আমাদের সঙ্গে কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে, সে যেন আমাদের এড়িয়ে চলছে।"

ধীরে ধীরে তাঁদের কথা শুনতে শুনতে ছেলেটির কঠিন বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আমানত সংগ্রহ করে সে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্তু তার এই কৃতিত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে এক মুসলিম নারী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পুরো সাফল্যের কৃতিত্ব নিজের নামে নিয়ে নেন। ব্যাংকের অধিকাংশ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও মুসলিম হওয়ায়, সে যতই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুক না কেন, কেউ তার কথা শোনেনি; বরং অন্যায়কারী কর্মকর্তার কোনো জবাবদিহিও করতে হয়নি।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হিসেবে সমাজের বৈষম্য ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে সে গভীর হতাশায় নিজের মনকে গুটিয়ে নিয়েছিল। তার মনের আর্তনাদ ছিল—"কেন ন্যায়ের পথে চলা মানুষকেই অন্যায়ের শিকার হতে হয়?"

নিজের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত এই নির্মম বাস্তবতা তার কাছে ছিল অসহনীয় দুঃখের কারণ। আর সন্তানের এই কষ্ট দেখে তাঁর বাবা-মাও গভীর উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন। সেই যন্ত্রণা ধীরে ধীরে পুরো পরিবারকে বিষন্নতার ছায়ায় ঢেকে ফেলেছিল। আমি তাঁদের সঙ্গে সমাজের অন্যায় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করিনি। বরং নীরবে তাঁদের ছেলের হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা অনুভব করার চেষ্টা করলাম। তারপর তাঁদের উদ্দেশে বললাম, "আপনাদের ছেলে নিশ্চয়ই আপনাদের দুশ্চিন্তায় ফেলতে চায়নি বলেই এতদিন একাই এই কষ্ট বহন করেছে। সত্যিই সে আপনাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাশীল—একজন অত্যন্ত স্নেহশীল সন্তান।"

আমার কথা শুনে মায়ের চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সমাজের অন্যায়ের বিচার নয়, বরং সন্তানের আহত হৃদয়ের প্রতি সহমর্মিতার এই কয়েকটি বাক্য যেন তাঁদের বুকের ভেতরে জমে থাকা দীর্ঘদিনের ভার গলিয়ে দিল।

কিছুদিন পর একটি আনন্দের সংবাদ পেলাম। মনের ভার কিছুটা লাঘব হওয়ার পর তাঁদের ছেলে আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় নতুন কর্মস্থলের সন্ধানে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। সে ক্রোধ, হতাশা ও প্রতিহিংসার অন্ধকারে—যাকে বৌদ্ধধর্মে চার অপায় (নরক, প্রেত, তির্যক ও অসুর)-এর মানসিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়—আটকে না থেকে বাস্তবতাকে গ্রহণ করেছে এবং নতুন জীবনের পথে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে একমাত্র বাবা-মায়ের গভীর ভালোবাসা এবং সন্তানের নির্মল হৃদয়ে গড়ে ওঠা পিতা-মাতা ও সন্তানের অটুট বন্ধনের শক্তিতে।

জীবনে যখন সবকিছু আমাদের ইচ্ছামতো হয় না, ঠিক তখনই আমরা প্রকৃত সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও অন্তরের শক্তির সন্ধান পাই। আমার আন্তরিক প্রার্থনা, এই মূল্যবান পারিবারিক বন্ধন যেন আরও দৃঢ় হয়। একই সঙ্গে আমরা যেন সমাজের সকল মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে দুঃখকে জয় করার প্রজ্ঞা ভাগ করে নিতে পারি এবং একে অপরের জীবনে আশা ও সাহসের প্রদীপ জ্বালিয়ে যেতে পারি।

মৈত্রী-করুণা থেকে উৎপন্ন কঠোরতা

রাহুলের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

জাপান মার্শল আর্টস হলে অনুষ্ঠিত যুদ্ধাহতদের জাতীয় স্মরণসভা (১৫আগষ্ট, ১৯৮৯।)

এই ঘটনাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় "কঠোরতা ও মমতার দ্বৈত নীতি"—মানুষকে গড়ে তুলতে ও সঠিক পথে পরিচালিত করতে গেলে, যেমন কোমলতা অপরিহার্য, তেমনি প্রয়োজন যথাযথ কঠোরতাও।

গৌতম বুদ্ধ এই নীতির উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। তাঁর অন্তরে ছিল অসীম মহাকারুণা, অথচ শিক্ষাদান ও শাসনের ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনে দৃঢ় কঠোরতাও অবলম্বন করতেন। নিম্নোক্ত ঘটনাটি তারই একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

বুদ্ধের পুত্র ও শিষ্য রাহুল তখন কিশোর। তিনি রাজগৃহের উপকণ্ঠে অবস্থিত উষ্ণ প্রস্রবণ বিহারে সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। কখনো কখনো গৃহী ভক্তরা বুদ্ধের দর্শনলাভের আশায় এসে জিজ্ঞাসা করতেন, "ভগবান এখন কোথায় অবস্থান করছেন?" তখন রাহুল কৌতুকবশে বিভ্রান্তিকর উত্তর দিতেন। বুদ্ধ যদি বেনুবন বিহারে থাকতেন, তিনি বলতেন, "সম্ভবত তিনি গৃধ্রকূট পর্বতে আছেন।" আবার বুদ্ধ যদি গৃধ্রকূটে অবস্থান করতেন, তিনি বলতেন, "মনে হয় তিনি বেনুবনে আছেন।" এই দুই স্থান প্রায় আট কিলোমিটার দূরে হওয়ায়, ভক্তরা অকারণে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন এবং শেষ পর্যন্ত বুদ্ধের দর্শন থেকেও বঞ্চিত হতেন।

এই বিষয়টি জানতে পেরে বুদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণ বিহারে উপস্থিত হলেন। তিনি রাহুলকে বললেন, "একটি পাত্রে জল নিয়ে এসো।" রাহুল জল নিয়ে এলে বুদ্ধ সেই জলে নিজের পা ধুয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাহুল, এই জল কি তুমি পান করতে পারবে?" রাহুল উত্তর দিলেন, "না, পা ধোয়া জল তো পানযোগ্য নয়।" তখন বুদ্ধ বললেন, "ঠিক তাই। যে জল একসময় নির্মল ছিল, ব্যবহারের পর তা আর পানযোগ্য থাকে না। তুমিও সন্ন্যাস গ্রহণ করে পবিত্র পথ অবলম্বন করেছ, অথচ সাধনায় মনোযোগ না দিয়ে, মনকে সংযত না করে, মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছ এবং তাতে আনন্দ পাচ্ছ। তাই তোমার বর্তমান অবস্থাও এই জলের ন্যায়।"

এরপর বুদ্ধ সেই জল ফেলে দিতে বললেন এবং আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "এই পাত্রে কি এখন আহার পরিবেশন করা যেতে পারে?" রাহুল বললেন, "না, কারণ এতে অপবিত্র জল ছিল।" বুদ্ধ বললেন, "ঠিক তেমনি, তোমার অবস্থাও এখন এই পাত্রের মতোই অপবিত্র।" এ কথা বলে তিনি পা দিয়ে পাত্রটিকে ঠেলে দিলেন। পাত্রটি গড়িয়ে কয়েকবার লাফিয়ে দূরে গিয়ে থামল।

বুদ্ধ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "পাত্রটি ভেঙে যাবে—এমন আশঙ্কা কি তোমার মনে হয়েছিল?" রাহুল বললেন, "না, এটি তো তেমন মূল্যবান নয়; ভেঙে গেলেও বিশেষ ক্ষতি নেই।" তখন বুদ্ধ গভীরভাবে উপদেশ দিলেন, "যদি তুমি এভাবে অসতর্কভাবে বাক্য ব্যবহার করে মানুষকে কষ্ট দাও, তবে তুমি এমন একজন ব্যক্তি হয়ে উঠবে, যাকে কেউ ভালোবাসবে না, কেউ হারালে দুঃখও অনুভব করবে না।"

এই কঠোর অথচ করুণাময় উপদেশ রাহুলের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। পরবর্তীতে তিনি নবউদ্যমে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, নিভৃতে পুণ্য সঞ্চয় করতে থাকেন এবং শেষপর্যন্ত "গোপন সাধনায় শ্রেষ্ঠ" উপাধি অর্জন করে বুদ্ধের দশ প্রধান শিষ্যের অন্যতম হয়ে ওঠেন।

নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১, 'বোধিবীজকে জাগ্রত করা' পৃ. ১০৩-১০৫।

সেদিনের অশ্রু থেকে পাওয়া শিক্ষা

রেভারেন্ড তাকাশি মায়েদা
পরিচালক, রিস্সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক মিশন।

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।

আমার জীবনে ধর্মবিশ্বাসের সূচনা হয়েছিল উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। রিস্সো কোসেই-কাই সংঘের সদস্যদের সঙ্গে আমরা এমন এক মহিলার বাড়িতে গিয়েছিলাম, যিনি যুদ্ধে তাঁর স্বামীকে হারিয়েছিলেন এবং নিজেও তাঁর ডান পা হারিয়েছিলেন। আমরা তাঁর রান্নাঘরের জন্য একটি তাক তৈরি করে দেওয়ার কাজে সাহায্য করেছিলাম।

কাজ শেষ করে যখন আমরা ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন সেই মহিলাটি ক্রাচের ভর দিয়ে কষ্ট করে আমাদের বিদায় জানাতে বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে বললাম, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ," এবং সাইকেল চালিয়ে রওনা হলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের পেছন থেকে একটি ভারী শব্দ শোনা গেল। পেছনে ফিরে দেখি, তিনি মাটিতে বসে পড়েছেন। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে, আর তিনি কাঁদতে কাঁদতেই আমাদের দিকে হাত নাড়াচ্ছেন।

তখন আমি একজন উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র। সেই দৃশ্য আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। আমাদের সামান্য সেবামূলক কাজও যে একজন মানুষের জীবনে এত গভীর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে, তা উপলব্ধি করে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সেই দিনের দৃশ্য আজও আমার হৃদয়ে অম্লান। সেটিই আমার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি, আর আজও সেই স্মৃতিই আমাকে সেবামূলক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অবিচল থাকার প্রেরণা জোগায়।

এই মাসের ধর্মদেশনায় সম্মানিত প্রেসিডেন্ট আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, "মানুষের অন্তরে এমন একটি আকাঙ্ক্ষা রয়েছে—'আমি একা নয়, সকলকে সঙ্গে নিয়ে সুখী হতে চাই।'" অন্যের জন্য যে আলোর প্রদীপ জ্বালানো হয়, তা শুধু অন্যের হৃদয়ই আলোকিত করে না; সেই আলো নিজের হৃদয়কেও উষ্ণতা ও আনন্দে ভরিয়ে দেয়। দান, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ, একটি আন্তরিক মধুর কথা কিংবা সামান্য সহানুভূতি—এসবই সেই আলোর প্রদীপের শিখা।

আমরাও যেন বোধিসত্ত্বের করুণাময় হৃদয় ধারণ করে আমাদের আশপাশের মানুষের জন্য প্রতিদিন একটি করে ছোট্ট আলোর প্রদীপ জ্বালাতে পারি। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুকর্মের ধারাবাহিকতাই মানুষের জীবনে সুখ বয়ে আনে এবং একই সঙ্গে আমাদের নিজের জীবনকেও আনন্দ, শান্তি ও পরিপূর্ণতায় ভরে তোলে।

১লা জুন, লন্ডন হোজার সদস্য মিস ইয়োকো ফিলিপসকে (সামনের সারির বামে) আন্তর্জাতিক মিশন বিভাগে স্বাগত জানাই (বিভাগীয় প্রধান রেভারেন্ড মায়েদা সামনের সারির মাঝখানে আছেন)।

A Global Buddhist Movement

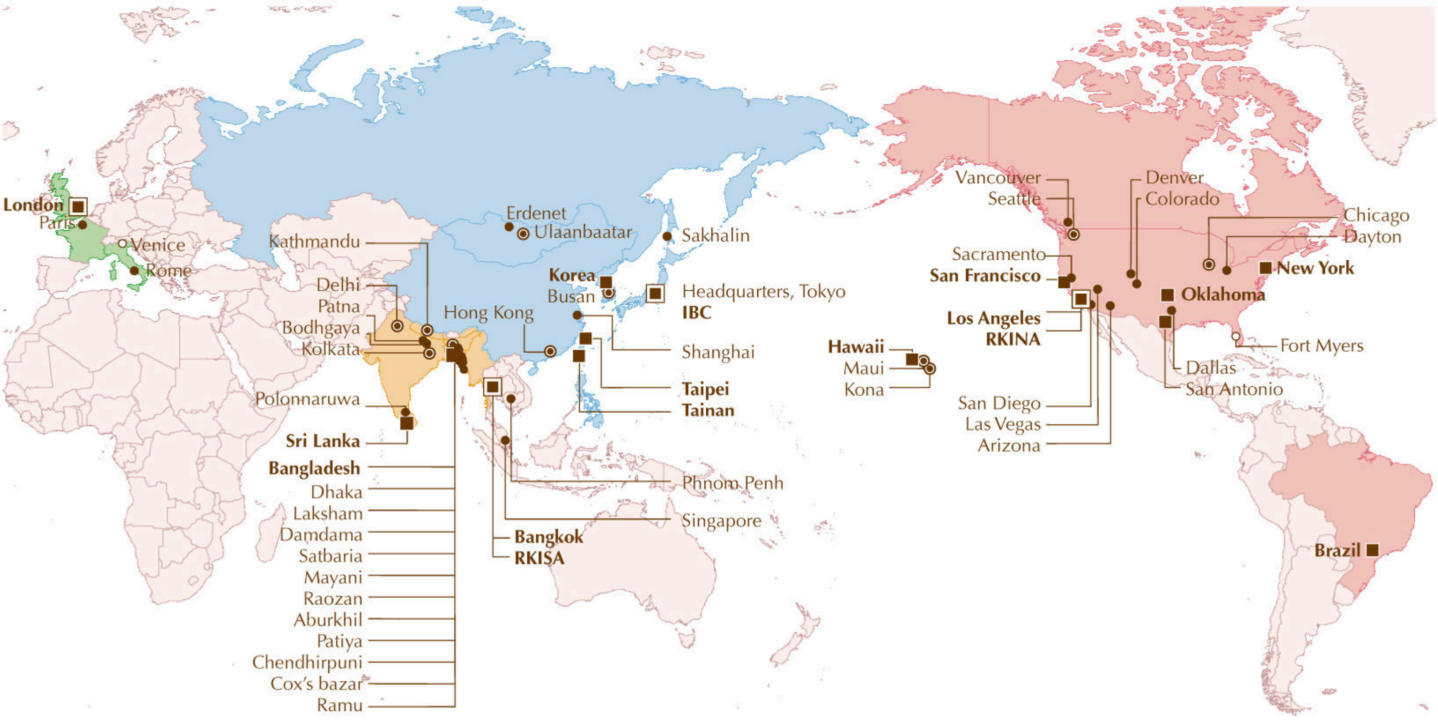

Information about local Dharma centers

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp